Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 71-84
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0722

রবীন্দ্রযুগের চার কবি: উপনিবেশিত মনের অন্বেষা
[Four Poets of the Tagorean Era: Exploring the Colonized Mind]

মো. আবুল ফজল*

Abstract

Initiated by Henry Louis Vivian Derozio in the first half of the 19th century, Anglo-Bangla poetry acquired a thoroughly colonial form in the second half of the 19th century. Michael Madhusudan Dutta and Biharilal Chakraborty later devoted themselves wholeheartedly to the colonial spirit. Rabindranath Tagore was their principal successor. Despite being driven by the West's colonial romantic spirit, he is the greatest poet of the Bangla language at the pinnacle of his creative thoughts and experience. Although he is not comparable to anyone in talent and creative works, several poets became quite famous during their lifetime in the first phase of Rabindra's era, that is, in the second half of the 19th century. Having remarkable expertise in European language and literature, some of them have strengthened the colonial future of Bengali poetry by presenting Western ideas in an Indian context according to the trend of the time. Surendranath Majumdar, Debendranath Sen, Akshay Kumar Baral and Dwijendralal Roy are among those poets with colonial disposition. This article mainly aims to assess the extent of colonization in their thinking.

Keywords: Nineteenth century, Rabindra era, Four poets, Colonisation, Colonised mentality.

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা কবিতায় উপনিবেশায়নের সূচনা হিন্দু কলেজের (১৮১৭) মাধ্যমে[১]। ব্যক্তি পর্যায়ে তার প্রথম কারুণিক ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১); 'ইঙ্গ-বাংলা কবিতার' প্রবর্তক তিনি। তাঁর উত্তরকালের বাঙালি কবিগণের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) উজ্জীবিত হয়েছিলেন উপনিবেশিত জাতীয়তাবাদী চেতনায়। প্রখ্যাত ইংরেজ কর্মচারী লেফটেনেন্ট কর্নেল জেমস টডের (১৭৮২-১৮৩৫) *রাজস্থান* (*Annals & Antiquities of Rajasthan*) অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮)। তাঁর পরের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) সর্বান্তকরণে সমর্পিত ছিলেন উপনিবেশিত চেতনায়। প্রধানত হোমারের (খ্রি. পূ. অষ্টম শতক) *Iliad*, ওভিডের (খ্রি. পূ. ৪৩-১৭/১৮ খ্রি.) *Heroides*, ভার্জিলের (খ্রি. পূ. ৭০-১৯) *Aeneid* এবং জন মিল্টনের (১৬০৮-১৬৭৪) *Paradise Lost*-এর দ্বারা প্রভাবিত তাঁর প্রায় সমস্ত রচনা। আর তাঁর সামসময়িক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) কবিতায় উপনিবেশায়ন মূলত ইউরোপীয় রোমান্টিক চেতনাপ্রসূত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এই দুজন কবির প্রধান উত্তরসূরী এবং প্রভূতভাবে উপনিবেশিত হয়েও সৃজনে মনন-অভিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় বাংলা ভাষার প্রধান কবি-ব্যক্তিত্ব। 'প্রতিভা' ও 'সৃষ্টিকর্মে' তাঁর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও রবীন্দ্রযুগের প্রথম-পর্ব অর্থাৎ উনিশ শতকের অপরার্ধের বেশ কয়েকজন কবি তাঁদের জীবদ্দশাতেই বেশ সুখ্যাত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় ভাষা-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় যুগপ্রবণতা অনুসারে পাশ্চাত্যের ভাবসম্পদকে 'ভারতবর্ষীয় মোড়কে' উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের কয়েকজন বাংলা সাহিত্যের 'উপনিবেশিত ভবিতব্যকে' সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে প্রভাবক ভূমিকা রেখেছেন। উপনিবেশিত মননের সেই কবিগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) অন্যতম।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা ৯২০৮, বাংলাদেশ; ই-মেইল: fazal@ban.ku.ac.bd

২.

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম যশোর জেলার জগন্নাথপুরে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে সেখানেই। শিশুবেলায় শিখেছেন সংস্কৃত ও ফারসি, ইংরেজি নীতিকথামূলক গ্রন্থও পাঠ করেছেন। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রধানত অনুবাদ। *মহাভারতে*র "কিরাতার্জুনীয়", পোপ ড্রাইডেনের (১৬৩১-১৭০০) *Eloisa to Abelard*, অলিভার গোল্ডস্মিথের (১৭২৮-১৭৭৪) *The Traveller* ও থমাস মুরের (১৭৭৯-১৮৫২) *Irish Melodies*-এর নির্বাচিত অংশ তাঁর কৈশোরক অনুশীলন হিসেবে অনূদিত। *ষড়ঋতু বর্ণন* (১৮৫৯) তাঁর প্রথম কাব্য। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি-বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য এটিই। তার পরে রচিত *সবিতা সুদর্শন* (১৮৬০) ও *ফুলরা* (১৮৬১) মূলত 'গাথাকাব্য'। দুটিই প্রণয়মূলক 'আখ্যায়িকা'। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে (১৮৫০-১৮৯৮) 'গাথাকাব্যের' প্রবর্তক মনে করা হলেও তাঁর *কিন্তু উদাসিনী*র (১৮৭৪) প্রায় দেড় যুগ পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র *ললিতা* (১৮৫৬) শীর্ষক গাথাকাব্যটি রচনা করেন। ওয়াল্টার স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) "Matrical Romance" যার আদর্শ। তারপরেই সুরেন্দ্রনাথের এ-দুটি কাব্য। পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) তাঁদের পন্থা অনুসরণ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য *বর্ষবর্তন* (১৮৭২)। নীতি ও আত্মচিন্তামূলক এ-কাব্যটিতে এডওয়ার্ড ইয়ংয়ের (১৬৮৩-১৭৬৫) অনুকৃতি স্পষ্ট। কাব্যটির প্রারম্ভে তাঁর *Night Thoughts* থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবণতা অনুধাবনে উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ:

> We take no note of time
> But from its loss: To give it then a tongue
> Is wise.[২]

সৃষ্টির ঐশ্বরিক উৎস, অন্তহীন কালচেতনা, আদিম আকর্ষণ ও প্রাকৃতিক আবহে নিজস্ব জগৎসৃষ্টির প্রয়াস—ইয়ংয়ের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তেমন চেতনা থেকেই কাব্যটিতে সুরেন্দ্রনাথ যুক্তিনির্দিষ্ট কালসীমাকে অস্বীকার করে আপাত-অস্থির জগতের বিচিত্র পরিবর্তনকে পরিবীক্ষণ করেছেন। কবির স্মরণে এসেছে রোম ও ফরাসি সাম্রাজ্যের কথা। সেই সূত্রেই মনে হয়েছে, কোথায় হারিয়ে গেছে বিরাটাকার সব সভ্যতা! কালের অন্তর্লীন এই স্রোতকে ভ্রূক্ষেপ না করেই মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করছে; অথচ প্রতিটি নতুন বছর মূলত মৃত্যুর দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। তাঁর এমন চিন্তার নেপথ্যে মধুসূদনের "নূতন বৎসর" কবিতাটির প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া উইলিয়াম শেক্সপিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) "Life is but a walking shadow"-এর ভাবনাসূত্রও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ১৮৬৭ সালে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেই অবস্থাতেও সুরেন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা করেছেন। মদ্যপানের অশুভ ফল প্রসঙ্গে রচনা করেছেন *নবোন্নতি* (১৮৬৯) ও *মাদকমঙ্গল* (১৮৭২)। দেশে তখন 'সুরাপান নিরোধ' আন্দোলন চলমান, প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) তার পুরোধা। গ্রন্থদুটির তিনি প্রশংসা করেছিলেন। ওই বছরই সুরেন্দ্রনাথ থমাস গ্রের (১৭১৬-১৭৭১) *Elegy* অনুবাদ করেন, পরের বছর অনুবাদ করেন *Bravo of Venice* এবং প্লেটোর *Immortality of the Soul*। এ-প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন:

> এই শেষোক্ত রচনা, ব্যাপক গাঢ় গবেষণায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কবি তিন বৎসর কাল গভীর পাণ্ডিত্য দ্বারা ইহার অবতরণিকা ও টীকা প্রস্তুত করেন, যাহাতে মূলে সক্রেটিসের জীবনী এবং টিপ্পনীতে পৃথিবীর ভূত-বর্তমান ধর্মবিশ্বাস, নব্যবৃদ্ধ দার্শনিক সত্য ও প্রাচীন গ্রীক-ভারতের আচারগত সাদৃশ্য সাবধানে আলোচিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রণেতার ভূয়োদর্শন ও বিচারশক্তি যেন সমস্ত সৃষ্টির পরিচয় লইয়াছিল।[৩]

১৯৭৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন টডের *রাজস্থান*। একই বছরে *মহিলা* কাব্যটি রচিত। তাঁর কবিজীবনের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এটি। তাঁর মৃত্যুর (১৮৭৮) পর অসমাপ্তরূপে (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ) কাব্যটি প্রকাশিত হয় (১৮৮০, ১৮৮৩)। কাব্যটির প্রেরণা বিহারীলালের *বঙ্গসুন্দরী*। *বঙ্গসুন্দরী* মূলত একাধিক নারীর স্তুতি হলেও *মহিলা* কাব্যটি নারীবন্দনার আরতিমন্ত্র। কাব্যটির "উপহার" অংশে কবি নারী-সৃষ্টির আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে মা এবং তৃতীয় ভাগ "জায়া" অংশে বিবাহ-প্রথা, বিধবাদের অবস্থা এবং নারীর স্বাধীনতা-প্রসঙ্গ বিধৃত। এগুলি তাঁর নারী-চেতনার পরিচায়ক। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সমাজদর্শনের আলোকে শিল্প-সাহিত্যে নারীকে 'হীন' হিসেবে উপস্থাপনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠেছিল, সেই চেতনাই কাব্যটিতে বিবৃত।

মহিলা কাব্যটিতে পাশ্চাত্যরীতিতে সুরেন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তির "invocation" বিদ্যমান। নবজাগ্রত নারী-অধিকার চেতনার প্রকাশ ছাড়াও বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রযুক্তি খুঁজে পাওয়ায় কাব্যটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) স্তুতি আছে: "অতি মহাজন তিনি, দুঃখ বিধধবার/ প্রতীকারে ভারতে প্রথম যত্ন যাঁর"[৪]। মধুসূদনের অনুসরণে সীতা চরিত্রের মধ্যে বিধৃত হয়েছে ভারতীয় নারীর অসহায় ক্রন্দনধ্বনি: "হে ভারত, মুগ্ধ তুমি স্বর্ণলঙ্কা প্রায়/ কত সীতা কান্দে দেখে সতত তোমায়"[৫] এবং হিন্দু শাস্ত্রে নারীর প্রতি অবিশ্বাসের ইন্ধন থাকায় তার প্রতি ধিক্কারও বিদ্যমান: "নারীর প্রতি অপ্রত্যয় ভারতে যেমন,/ আর নাহি লক্ষ্য হয় কোথাও এমন"[৬]।

দেশি-বিদেশি সাহিত্য দর্শন নির্বিশেষে নারীর অবস্থা, মর্যাদা, প্রেম, ত্যাগ, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলির পরিচয় তিনি যেখানে যত পেয়েছেন; প্রায় সবই তুলে এনেছেন এই কাব্যে। যেমন, ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) প্রবন্ধ, শেক্সপিয়রের নাটক, পোপের কবিতা, গোল্ডস্মিথের রচনাসমূহ ও রোমান্টিক কবিদের কাব্যসাহিত্য থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি। যার আভাস তিনি দিয়েছেন কাব্যটির "অবতরণিকা" অংশের 'টিপ্পনীতে' (১৯৯-২০৩)। অসমাপ্ত হলেও সেখান থেকেই সুরেন্দ্রনাথের মর্মে ক্রিয়াশীল বিদেশি সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্পর্কে জানা যায়। মঙ্গো পার্কের (১৭৭১-১৮০৬) ভ্রমণবৃত্তান্তে (*Park's Travels*) বর্ণিত নারীর করুণাসূচক গুণাবলি কাব্যটির "অবতরণিকা" অংশের সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করেছে। এছাড়া এই অংশের একটি স্তবকের ["শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে"[৭]] টীকায় বিধৃত হয়েছে আরবীয়, ভারতীয়, হিব্রু ও খ্রিষ্টশাস্ত্রে নারী-পুরুষের উৎপত্তিপ্রসঙ্গ। তারপরই ক্যাম্পবেলের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি: "And man the hermit sighed till woman smiled"[৮]; যা থেকে বোঝা যায়, উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটির ভাবনাসূত্রেই স্তবকটি প্রণীত।

সমগ্র কাব্যটির পরিকল্পনা 'রোমান্টিকতাবাদের' পূর্ববর্তী 'মেটাফিজিক্যাল' বা 'অগাস্টীয়' প্রবণতার মতো যুক্তিশৃঙ্খলে গাঁথা। সে-কারণে হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রীয় স্থূল ভাবোচ্ছ্বাস এতে নেই। নিজের কালে তাই সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন উপেক্ষিত; অথচ কবি হিসেবে তাঁর মননশীলতা, কাব্যবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা ও শব্দযোজনার অভিনবত্ব সে-কালের বিবেচনায় বেশ প্রাগ্রসর। এমন শ্রমসাধ্য কাব্যপ্রকল্প বাংলা সাহিত্যে বিরল, তবুও কাব্যের "ভগ্নী" অংশের দ্বিতীয় স্তবকে হতাশ হয়ে তাঁকে বলতে হয়েছে: "তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,/ লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার"[৯]।

৩.

রবীন্দ্র-সামসময়িক যুগের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। ১৮৮০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তেত্রিশ বছরে বাংলা কবিতায় বিচিত্র-রকম নিরীক্ষা করে তিনি স্বতন্ত্র ধারার কাব্যরীতি প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের গাজীপুরে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পাশ করার পর

শিক্ষকতায় নিয়োজিত থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে তিনি স্নাতক সম্পন্ন করেন। আরও সাত বছর পর ইংরেজি সাহিত্যেই করেছেন স্নাতকোত্তর।

বিহারীলাল বাংলা কাব্যে যে 'ego' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব বিকশিত সেই ধারাতেই। সংসারের সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে বিহারীলাল স্বতন্ত্র হতে চেয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথে তেমন পরিপার্শ্ব-বিচার নেই। বাহিরকে অন্তরের সুন্দর স্বপ্নে রঞ্জিত করতে গিয়ে দেশ-কালের সমস্যার দিকটি বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি। এ-প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হলো:

> আমি পুরাতন স্কুলের মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। এই রবীন্দ্র-যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত। আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু। ইংরাজী কবিদের মধ্যে Wordsworth-কে আমি বড় পছন্দ করি। সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবও আমার কবিতায় বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারেন। আমি ইংরাজীতে এম. এ. পাশ করিয়া আবার সংস্কৃতে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু আমার সংস্কৃত সাহিত্যটা পড়া হইয়া গেল।[১০]

প্রথম জীবনে মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি রচনা করেছিলেন *ফুলবালা* (১২৮৭) ও *ঊর্মিলা কাব্য* (১২৮৭)। *ফুলবালা* মূলত গোলাপ কদম রক্তজবা কৃষ্ণকলি মল্লিকা কেতকী অপরাজিতা প্রভৃতি ফুলের বন্দনা। ইতঃপূর্বে বাংলা কাব্যে ফুলের এমন সঙ্কলন আর হয়নি; প্রকৃতির এমন সমারোহে রোমান্টিক 'সৌন্দর্য পিপাসাও' ব্যক্ত হয়নি কখনও। বিহারীলালও সাধনা করেছিলেন সৌন্দর্যের, তাতে অদ্ভুতত্ব ছিল; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনায় দৃষ্টি ও হৃদয়ের পরিতৃপ্তির মাধ্যমে পঞ্চেন্দ্রিয়ের উল্লাসই প্রধান। ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) ও পার্সি বিশি শেলিকে (১৭৯২-১৮২২) তাঁর ভালো লাগতো; সে-কালের অন্যান্য বাঙালি কবির মতো প্রকৃতির সঙ্গে কবিচিত্ত বিনিময়ের দীক্ষাটিও তাই তাঁদের কাছেই পাওয়া। জন কিট্‌সের (১৭৯৫-১৮২১) 'ইন্দ্রিয় চেতনাও' প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। নিজস্ব বৈষ্ণবভক্তির আবেগ ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তিনি তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও স্বতন্ত্র হতে পেরেছেন। *ঊর্মিলা কাব্য* তাই সে-কালে নবজাগ্রত নারী-মর্যাদাবোধের প্রেরণারও অতিরেক। কাব্যটির নামপত্রে উদ্ধৃত কাবিতাংশটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

> These are great maxims, sir, it is confess'd;
> Too stately for a woman's narrow breats.
> Poor love is lost in men's capacious minds;
> In ours, it fills up all the room it finds.[১১]

দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য *নির্ঝরিণী* (১২৮৭) মূলত কয়েকটি গীতিকবিতার সঙ্কলন। তার মধ্যে "কল্পনা" কবিতাটি কিট্‌সের "Ode to Fancy"-এর ভাব এবং "ময়না" কবিতাটি এডগার এলান পোর (১৮০৯-১৮৪৯) "Raven"-এর বিষয়-বিন্যাস অনুসরণে লেখা। এছাড়া "ঈশ্বরের প্রতি" কবিতাটি টমাস মুরের একটি কবিতার অনুবাদ এবং "আঁখির মিলনে" ক্রিয়া করেছে শেলির "Love's Philosophy":

> প্রকৃতির সাথে হয় কবিচিত্ত বিনিময়
> সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন
> ওই আঁখির মিলন।[১২]

১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় *অশোকগুচ্ছ*। কাব্যটিতে দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনার বিভিন্ন স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। মোহিতলাল মজুমদার সেই স্তরগুলিকে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। প্রথম স্তরে 'সৌন্দর্য-সাধনা', দ্বিতীয় স্তরে 'সৌন্দর্য-সাধনার সঙ্গে হৃদয়ের বিস্তার', তৃতীয় স্তরে 'প্রীতির সঙ্গে সৌন্দর্যদৃষ্টির মিলন', চতুর্থ স্তরে 'সৌন্দর্য-দৃষ্টি ক্ষীয়মাণ হয়ে প্রীতির আধিপত্য' এবং ক্রমশ তা উন্নীত

হয়েছে ভক্তিতে। একই কাব্যে ভাবের এমন ক্রমোন্নতি সাক্ষ্য দেয়, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর সহজ অথচ প্রবল ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং গার্হস্থ্য দৃষ্টি রবীন্দ্র-সংবেদ দ্বারা প্রভাবিত। এমন গার্হস্থ্যরস ইতঃপূর্বে মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এমনকি বিহারীলালেও ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে প্রবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির যোগেই দেবেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি কবিতার নাম 'লক্ষ্ণৌ আতা'। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন:

চাহিনা আনার—যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর!
চাহি নাক 'সেউ'—যেন বিরহ বিধুর
জানকীর চির পাণ্ডু বদন রুচির!
একটুকু রসে ভরা, চাহিনা আঙ্গুর
সলজ্জ চুম্বন যেন নববধূটির![১৩]

কবিতায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি রূপায়ণের এমন দৃষ্টান্ত বিশেষত কিট্‌সের কাব্যে দৃশ্যমান। উদাহরণ হিসেবে তাঁর "The Eve of St. Agnes" কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতি:

And still she slept an azure-lidded sleep,
In blanched linen, smooth, and lavender'd,
While he from forth the closet brought a heap
Of candied apple, quince, and plum, and gourd:
With jellies soother than the creamy curd,
And lucent syrops, tinct with cinnamon;
Manna and dates, in argosy transferr'd
From Fez; and spiced dainties, every one,
From silken Samarcand to Cedar'd Leabanon.[১৪]

উপর্যুক্ত কবিতা দুটির তুলনা থেকে বোঝা যায়, কিট্‌সের মতো প্রতিটি শব্দে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভার সঞ্চার করা দেবেন্দ্রনাথ পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিট্‌সের তীক্ষ্ণ পরিমিতিবোধ, সজাগ গাঢ়বদ্ধতাও তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত; তবুও পরিণত ফলের এক একটি উপমা অনুভবকে দৃষ্টি-সম্মুখে এনেছে এবং শেষে অভিপ্রেত 'রস-পরিণতি', চাঞ্চল্য-উল্লাস (ইঙ্গিতে যা রমণীয় রূপে আরোপিত) ও নিহিত রস-উৎসার 'বোধি' হিসেবেই ব্যক্ত। উদ্ধৃতিটিতে 'ব্রজসুন্দরীর' উল্লেখ থাকলেও এই কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়পিপাসা ভারতীয় সংস্কার-জারিত, বিশুদ্ধ ও বৈষ্ণবভক্তিশূন্য।

রচনারীতির দিক থেকেও দেবেন্দ্রনাথ সেন মধুসূদন বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। মধুসূদন প্রবর্তিত নব্যরীতির প্রবহমান 'পয়ার' ছন্দেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। পয়ার ছাড়াও প্রবহমান 'যতিপ্রান্তিক দ্বিপদী-ত্রিপদী' এবং 'মিত্রাক্ষর ছন্দবন্ধই' তিনি ব্যবহার করেছেন অধিক। এছাড়া সংস্কৃত ছন্দের যে প্রয়োগ-নিরীক্ষা হেমচন্দ্র করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তারও অনুসরণ করেছেন *মেঘদূতের* অনুবাদে ও 'স্তোত্র' রচনায়। বিশ শতকের প্রারম্ভে তিনি 'রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক' উচ্চারণে এবং রবীন্দ্র-আদর্শে 'সরল কলামাত্রিক রীতিতেও' কাব্যরচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির' কিছু সনেটে এবং 'মিত্রাক্ষর পদবন্ধতেও' রবীন্দ্র-প্রভাব বিদ্যমান।

দেবেন্দ্রনাথ প্রায় দেড়শো সনেট লিখেছেন; কিন্তু কোনোটিতেই আদর্শ হিসেবে ফ্রান্সিস পেত্রার্ককে (১৩০৪-১৩৭৪) অনুসরণ করেননি। ক্ষেত্রবিশেষে মিল্টন দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিশুদ্ধ বা আংশিক শেক্সপিয়রীয় রীতিতে তিনটি 'চতুষ্পঙ্‌ক্তিক স্তবকের' শেষে একটি 'দ্বিপঙ্‌ক্তিকের' মেলবন্ধনেই রচিত তাঁর

অধিকাংশ সনেট। *কড়ি ও কোমলের* শেক্সপিয়রীয় আদর্শও তাঁর সামনে ছিল; কিন্তু মিল্টনের অনুসরণে তিনি অষ্টক-ষট্‌ক ভাগ রাখেননি; যেমন, অশোকগুচ্ছের "মা" কবিতাটি। মধুসূদনের মতো দেবেন্দ্রনাথ "sonnet-sequence"ও রচনা করেছেন। এছাড়া অল্প কয়েকটি সনেটে আছে 'মহাপয়ার পঙ্‌ক্তির' ব্যবহার; যেমন, *অশোকগুচ্ছের* "রাক্ষসী"। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর বেশিরভাগ সনেটেই 'চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির বন্ধন' ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই।

৪.

রবীন্দ্রযুগের গুরুত্বপূর্ণ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। কলকাতায় তাঁর জন্ম। হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন। লেখাপড়ায় প্রবল অনুরাগের কারণে অল্প-বয়সেই ব্যুৎপত্তি ঘটেছে দেশি-বিদেশি সাহিত্যে। বিহারীলালের সঙ্গে আলাপ ছাত্রজীবনেই। সে-সময় তাঁর কাছে কলকাতার নবীন প্রায় সকল লেখকেরই যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬) বা অক্ষয়কুমার চৌধুরীদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থেকে অল্প বয়সেই তিনি বিহারীলালগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন।

অক্ষয়কুমারের প্রথম কাব্য *প্রদীপ* (১৮৮৪)। যার প্রথম ভাগের কবিতাগুলিতে অপার সৌন্দর্যের প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিপাত লক্ষণীয়। বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত রহস্যের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন নারীর রূপেই সকল সৃষ্টির চরিতার্থতা। মাত্র এক বছর আগে *প্রভাত সঙ্গীতে* রোমান্টিক বিস্ময়ের রসসঞ্চার করেছেন রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু তার মধ্যে নারী কখনও সংরাগ-রক্তিম রূপে প্রস্ফুটিত হয়নি। *বঙ্গসুন্দরীর* বিহারীলালকে দৃষ্টান্ত ধরে নিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরতার সঙ্গে তিনি *প্রদীপের* 'নারী বন্দনা' লিখেছেন। অক্ষয়কুমারের 'মানসী প্রতিমা' তবুও দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সমন্বয়রূপিণী 'সারদার' অনুকৃতি নয়। মোহিতলাল মজুমদার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: "সারদার একটি দিক—বিশ্বের অন্তঃপুরে তাহার সেই রহস্যময়ী মূর্তি শেলির কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল কবির অবাস্তব রূপপিপাসার ইন্ধন যোগাইয়াছে"[১৫]। উক্তিটিতে উল্লিখিত শেলির মতো অক্ষয়কুমারের 'মানসী প্রতিমা' পার্থিবতা-বর্জিত নয়। বাস্তবের এষণাই তাই তাঁর মধ্যে অধিক। এ-প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের "নারী বন্দনা" ও শেলির একটি কবিতার প্রতিতুলনীয় উদ্ধৃতি:

(ক) রমণীরে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে,—
দেবপ্রাণ বেদগানে সাধা।[১৬]

(খ) Sweet Benedictions in the eternal curse!
Veiled glory of this lampless Universe!
Thou moon beyond the clouds! Thou living Form
Among the Dead! Thou star above the storm![১৭]

ভুল (১৮৮৭) কাব্যে অক্ষয়কুমারের অতৃপ্ত কামনা বেশ শান্ত; *প্রদীপের* 'মানসী প্রতিমা' তাই নতুন রূপে কাব্যটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর বোধের এই বিবর্তনের মূলে আছে গভীর এক তাৎপর্য ["সুখ দুঃখ হলো শেষ, হলো শেষ কারে ঘুরে"[১৮]]; তাকে আশ্রয় করেই "অদৃষ্ট বালা" কবিতায় তিনি প্রশ্ন করেছেন: "পরিত্যক্ত ভগ্ন ঘরে এ ঘর ও ঘর করে/ কেহ কি, কি যেন তার না পেয়ে খুঁজিয়া,—/ কখন কি কেঁদে ওঠে, দ্বারপানে নাহি ছুটে,/ আপনার পদশব্দ কাহারে বুঝিয়া"?[১৯] কবির অধ্যাত্ম এই অনুভবটি রবার্ট ব্রাউনিঙয়ের (১৮১২-১৮৮৯) প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। "Evelyn Hope" কবিতায় ব্রাউনিঙ যেমন ঈশ্বরের প্রতি একান্ত বিশ্বাসে বলেছেন:

... God above
Is great to grant, as mightly to make,
And creates the love to reward the love;
I claim you still, for my own love's sake![২০]

অক্ষয়কুমারও তেমনি ঈশ্বর বিশ্বাসেই খুঁজে পেয়েছেন *ভুল*-নিরুক্ত সেই প্রশ্নের উত্তর। *প্রদীপের* "জীবনে আশ্বাস দিয়ে মরণে বিশ্বাস দিয়ে/ যেমন গড়িয়াছিলে পুন গড়ে লাও"[২১] উক্তিটির মতো *ভুল* কাব্যেরও "ডুবিছে তপন" কবিতায় সেই আশ্বাসই পুনর্ব্যক্ত।

শঙ্খ কাব্যের কিছু কবিতা তিনি বিন্যস্ত করেছেন ব্রাউনিংয়ের অনুসরণে। ব্রাউনিংয়ের "Pippa Passes" কবিতাটি পাঁচটি অংশ বিভক্ত: "Introduction", "Morning", "Noon", "Evening" ও "Night"; আর *শঙ্খ* কাব্যের কবিতাগুলির ভাগ হলো: "প্রভাতে", "মধ্যাহ্নে", "অপরাহ্ণে", "সায়াহ্নে", "প্রদোষে" ও "নিশীথে"। অর্থাৎ কবিতাগুলিতে হৃদয়ের ক্রমবিকাশ দেখাতে ব্রাউনিংয়ের বিন্যাসরীতির প্রভাব স্পষ্ট। তারই একটি কবিতায় তিনি বলেছেন:

তারকায় তারকায় হা হা করে তোমা তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ পরে!
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু যন্ত্রণায় অবসান?
ধর এ জীবনাহুতি-বিরহের শেষ গান।[২২]

"জীবনাহুতি-বিরহের শেষ গান" হিসেবে "এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু যন্ত্রণার অবসান?" এমন উত্তরিত বোধ ও জীবনজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি *এষা* কাব্যে (১৩১৯)। কাব্যটির শুরুতেই পূর্ববর্তী কাব্যসমূহের রোমান্টিক ঊর্ধ্বচারী কল্পনাকে সংযত করে তিনি বলেছেন:

নহে কল্পনায় লীলা-স্বরগনরক,
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাববন্ধ বাক্য রসাত্মক
মানবীর তরে কাঁদি, যাচিনা দেবতা।[২৩]

*এষা*কে কবি-পত্নীর 'স্মৃতিকাব্য' বলা হয়; কেননা সেই অভিজ্ঞতাই *এষা*র পটভূমি। কাব্যটিতে তাই 'কল্পনা বিলাসের' আশ্রয় না নিয়ে সরলভাবে তিনি জীবনের কথা বলেছেন। তবুও বিপিনচন্দ্র পাল মনে করেন, কাব্যটি টেনিসনের "In Memoriam"-এর অনুসরণে লেখা। তবে, *এষা*র দ্বিতীয় সংস্করণের "পরিচয়" অংশে তিনি "In Memoriam" ও *এষা*র তুলনামূলক আলোচনায় বলেছেন যে, টেনিসনের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও *এষা* সর্বাংশে "In Memoriam"-এর অন্ধ অনুকরণ নয়। যেমন, *এষা*তে খ্রিষ্টীয় মননের ছাপ নেই কোনো; মনের গভীর সংবেদনকে উপস্থাপন করার পদ্ধতি হিসেবে অক্ষয়কুমার "In Memoriam"কে শুধু পাশে রেখেছিলেন[২৪]।

এষা কাব্যটি "উপসংহার, "নিবেদন", "মৃত্যু", "অশৌচ", "শোক", "সান্ত্বনা" ও "বন্ধু" শীর্ষক কয়েকটি অংশে বিভক্ত। যে ধরনের সন্দেহ, বিহ্বলতা ও বিরহের মধ্য দিয়ে হ্যালামকে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন টেনিসন ["We lose ourselves in light" (XLVII), "An infant crying in the night,/ an infant crying for the light" (LIV), "His inner day can never die" (LXVI), "His night of loss is always there" (LXVI), "His being working in mine" (LXXXV)], মৃত্যুর পরে হলেও আধ্যাত্মিক সুখের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর ব্যক্তিগত শোক যেভাবে আত্মচেতনায় অবলুপ্তির মাধ্যমে বিশ্বচেতনায় উন্নীত ["He sees himself in all he sees" (XCVII), "Behold, I dream a dream of good,/ And mingle all the world with thee"

(CXXIX)] এবং মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাঁর শাশ্বত প্রেম যেমন অমরত্বের জয়গানে প্রতিষ্ঠিত; অক্ষয়কুমারও প্রায় সমস্থানিক চেতনায় অস্থির চিত্তকে শান্ত করার প্রয়াস করেছেন।

ইংরেজি কাব্যের এমন এষণাকে আয়ত্তে এনেছিলেন বলেই, তাঁর কাব্যের ভাষা এতটা সংযত। রুচিশীল এমন লিরিক রচনা যে তাঁর ঈপ্সিত, সেই বার্তাটি দিতেই *ভুল* কাব্যের প্রারম্ভে তিনি উদ্ধৃত করেছেন ইয়োহান গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) এই উক্তিটি: "All good lyrics must be reasonable as a whole,/ And yet in details a little unreasonable"[২৫]।

৫.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উনিশ শতকের প্রধানতম গীতিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ কবি। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। ১৮৮৪ সালে 'স্টেট স্কলারশিপে' ইংল্যান্ড যান এবং বিদেশি সঙ্গীতচর্চা সেখানেই; গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর পরবর্তীতে যা স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। ইংল্যান্ডে থাকতেই প্রকাশিত হয় তাঁর *Lyrics of Ind* (১৮৮৬)। ইংরেজি ভাষায় রচিত হলেও কাব্যটির সঙ্গে তাঁর পরবর্তী বাংলা কবিতা ও গানের সম্বন্ধ খুব গভীর।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই। বিলেত যাওয়ার পথে জাহাজের স্মৃতিচারণে বলেছেন: "একদিন এক সাহেব আমাকে বলিলেন, তুমি যে কেবল পড়ই দেখিতেছি, গল্প কর না কেন? আমি জাহাজে শেলি (Shelley), কীটস্ (Keats) পড়াতে আমার নাম কবি রাখিলেন এবং কার্লাইল (Carlyle) পড়াতে আমার নাম স্কলার (Scholar) রাখিলেন। আমাকে কেহ বিরক্ত করিতে আসিলে শেক্সপিয়র, বায়রণ বা শেলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। তাহাতে সকলেই রণে ভঙ্গ দিতেন"[২৬]। *Lyrics of Ind*-এর রচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক যে, বিদ্যাভ্যাস কালে Manfred I Childe Harold-এর দুই Canto এবং মেঘদূত-উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাতে গিয়া ক্রমাগত Shelly পড়িতাম ও তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া Wordsworth ও Shakespeare পড়িতাম। বিলাতে গিয়া ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসহ কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন এবং কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে 'Lyrics of Ind' আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।[২৭]

Lyrics of Ind-এর আগেই প্রকাশিত হয় *আর্যগাথা* (প্রথম ভাগ, ১৮৮২)। ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "প্রকৃতি-বিষয়িণী গীতি এদেশে তত প্রচলিত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বোধ হয় ইহা নিন্দনীয় হইবে না। সঙ্গীতের কবিতা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়। প্রকৃতি মাধুর্য্যে উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তবে হৃদয়ের কবিতা বলিয়া গণ্য হইবে না কেন[২৮]? প্রকৃতিগীতি ছাড়াও এই কাব্যে ঈশ্বর, আত্মানুভূতি ও দেশপ্রেমের প্রকাশ স্পষ্ট। ঈশ্বর ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় আছে মানব ও দেবলোকের সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা। এইসব কবিতায় যে প্রকৃতি-চেতনা ও বিষাদ ফুটে উঠেছে, তা আরও ব্যঞ্জনাবহ *আর্যগাথায়*। কবিমনের রোমান্টিক প্রবণতাও সেখানে ঈপ্সিত। ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার প্রভাবে নির্মিত কবির এই মানসিকতা। বিদেশি শিক্ষার ফলস্বরূপ যে ইতিহাসবোধ ও দেশচেতনা তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ *আর্যগাথার* "আর্যবীণা" অংশ। দেশপ্রেমের এই গানগুলি মূলত তাঁর দেশ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধ্যানের ফল। স্বদেশী আন্দোলনের কর্মপন্থা-সন্ধান করতে গিয়েও অস্পষ্ট সেই প্রেমস্বপ্নের ত্রুটিগুলি ধরা পড়েনি। সে-জন্যই হেমচন্দ্র একদা যেমন "ভারত ভিক্ষা" রচনা করে প্রিন্স অব ওয়েলসের বন্দনায় পঞ্চমুখ হয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি লিখেছেন:

গাও আর্যসূতচয়।
মিলিয়া গাওরে ব্রিটন মহিমা
ভাস রে হরষে ভারত হৃদয়।[২৯]

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচেতনায় রোমান্টিক প্রবণতা ও দেশপ্রেম সন্নিভূত হয়েছে বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। তৎকালীন বাঙালি কবিদের বহুল পঠিত বায়রন ও মুরের প্রভাবও *আর্যগাথায়* বিদ্যামান। সমুদ্রের কবিতায় ("সাগর-যাওরে কল্লোলি") বায়রনের প্রতিধ্বনি ও দেশপ্রেমের গানেও তাই মুরের *Irish Melodies*-এর প্রভাব বেশ প্রকট।

রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্ররা ইয়োরোপীয় ভাবসম্পদকে বাংলা কাব্যে রূপায়ণের যে আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সারাজীবন তাঁরই অনুসারী। *Lyrics of Ind*-এ তাই 'শ্বেতদ্বীপের কাব্যসরস্বতীর' সঙ্গে তিনি 'শ্বেতভুজা ভারতীর' মিলনসূত্র রচনা করেছেন। একদা *Lyrics of Ind*-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন: "My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian Poetics as they ought to be"[৩০], তাঁর সেই উদ্দেশ্য কেবল এই একটি কাব্যেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে ইউরোপীয় গীতি ও সাহিত্যের চেতনাকে তিনি ভারতীয় ছন্দে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতে রূপায়ণ করেছেন।

আর্যগাথার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে। দশ বছর আগের প্রকৃতিপ্রেমিক কবি এখানে মানবপ্রেমিক। এই অংশের কবিতার মৌল-প্রেরণা নারী, কবিপত্নীই সেই প্রেরণার উৎস। যাকে আশ্রয় করে তিনি সূক্ষ্ম তন্দ্রাতুর ও পেলব 'লিরিক্যাল' পঙ্ক্তি নির্মাণ করেছেন। *প্রেমপ্রবাহিনীর* বিহারীলাল যেমন প্রিয়ার অন্বেষণে ব্যাকুল, *কল্পনার* রবীন্দ্রনাথ 'শিপ্রা নদীর পারে' খুঁজেছেন পূর্ব-জন্মের প্রথমাকে, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি দেশ-বিদেশে সেই 'মানসী প্রতিমার' অন্বেষণ করেছেন। বাংলা কবিতায় প্রথম তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পসৌন্দর্যের মিশ্র-স্মৃতিতে বাঙালি কবির মানস-প্রতিমা হৃদয়সংবেদী রূপ লাভ করেছে। "Tender is the right./ And haply the Queen Moon is on her throne"[৩১], কিট্‌সের এই ভঙ্গিতে রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন:

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎ পাশে চাঁদের অলস প্রাণ;
আয় লো স্বপন খানি
যামিনী বহিয়ে যায়;
অধরের মধুর হাসি
আয় আয় আয়।[৩২]

এই গ্রন্থের "পিউ" শীর্ষক অংশটি (কাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত, "কুহু" ও "পিউ") মূলত অতিপ্রসিদ্ধ ইংরেজি, স্কচ ও আইরিশ সঙ্গীতের অনুবাদ। ইংল্যান্ডে থাকতেই যে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজি স্কচ ও আইরিশ গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ওই সময়ের কয়েকটি চিঠিতে তার প্রমাণ রয়েছে। স্কচদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি লিখেছেন:

> স্কটল্যাণ্ডবাসী ইংলণ্ডবাসীকে ঘৃণা না করুক অন্ততঃ তাহাদের সহিত হরিহর আত্মা নয়। স্কট-কবি নিজের পাহাড়ময় দেশেরই গান করেন: 'The land of Lakes, the land of Lakes', 'Auld lang Syne' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান ইংলণ্ডের মহিমাকীর্তন নহে। ... স্কটল্যাণ্ড বীরের জননী। তাহাদের দেশও ব্রুস ওয়ালেসের প্রসূতি। তাহাদেরও বিস্তৃত সাহিত্য আছে, তাহাদেরও স্কট, বার্ণস ও কার্লাইল আছে। স্কচ জাতির দেশপ্রেমিকতা গভীর অপরিমেয়। প্রতি গানেই তাহার স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান।[৩৩]

এছাড়া আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "আয়ারল্যাণ্ড ডিউক অব ওয়েলিংটন, বার্ক ও মুরের জননী। তাহাদের বাহুবল আছে, বুদ্ধি আছে"[৩৪]। ইংল্যান্ডে থাকতেই তিনি স্কচ ও আইরিশদের মতো দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর অনুবাদ-সঙ্গীতগুলিতে তাই দেখা যায় তাঁদেরই গানের প্রাধান্য। স্কচ গানের মধ্যে "Robin Adiar", "Land of the Leal", "Bluebells of Scotland", "Auld lang Syne", "Annic Laurie" ও "Auld Robin Gray" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গানটি স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত গাথা। স্থানিক পরিবেশ বদলে দ্বিজেন্দ্রলাল গানটিকে বাংলার গ্রামীণ গাথায় রূপান্তরিত করেছেন। ইংরেজি গানের মধ্যে "Home sweet Home", "Lines to an Indian air", "Under the green wood tree", "Weep no more, Ladies", "Rule Britania" বিশেষভাবে পরিচিত। এছাড়া "Rule Britania"-এর আদর্শে তিনি প্রথমে "যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে"[৩৫] রচনা করেছিলেন; পরিণত বয়সে সেটিরই পরিবর্তিত রূপ: "যেদিন সুনীল জলধি হইতে"[৩৬]। অনূদিত আইরিশ গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: "Last Rose of Summer" এবং "Go where glory waits thee"। এইসব প্রবণতা সাক্ষ্য দেয়, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভাব ও সুর-সম্মিলনের চেষ্টা করেছেন।

আষাঢ়ে (১৮৯৯) কাব্যটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিসত্তা আবারও পরিবর্তিত। কাব্যটি সম্পর্কে তিনি ইংরেজি একটি 'ব্যঙ্গ কাব্যের' ঋণ-স্বীকার করেছেন: "বিলাত হইতে ফিরিয়া বাঙ্গালা ভাষার হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে *Ingoldsby Legends*-এর অনুসরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি"[৩৭]। কবি নিজেই ঋণ-স্বীকার করলেও, *আষাঢ়ের* সঙ্গে রিচার্ড হ্যারিস বারহামের (১৭৮৮-১৮৪৫) *Ingoldsby Legends*-এর আত্মিক সম্পর্ক খুব দুর্বল। বারহামের আকর্ষণ ছিল "grotesque miracle"; মধ্যযুগের গল্প, সংস্কার, ভৌতিক বিষয়াদি, ধর্মব্যবস্থা ও অমার্জিত লোকগীতিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন লঘু ভঙ্গিতে। *আষাঢ়ের* "ভট্ট সভাতে" তেমন প্রাচীন কাহিনির ব্যঙ্গাত্মক অনুসরণ আছে। *Ingoldsby Legends*-এর গল্প বলার ভঙ্গি, ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বারহামের হাস্যরসাত্মক মিলের ("limb: thats him", "saw: caw", "claw: Jackdaw", "swore: snore", "Captatin m'Fuze: Snooz") অনুসরণে *আষাঢ়ে* দ্বিজেন্দ্রলাল "মোয়াঃ ধোয়া", "বাধাঃ গাধা", "নাটক: আটক", "দুর্গেশনন্দিনীঃ ভাবতেন বসে তিনি" প্রভৃতি শব্দবন্ধে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ স্কচ আইরিশ ও ইংরেজি ব্যঙ্গ-কবিতার বিচিত্র ভাঙা ছন্দ ও 'শ্ল্যাঙের' মিশ্রণ, চার-পাঁচটি ভাষার শব্দ ও উদ্ধৃতি, 'শব্দ ভেঙে বাকি অংশ দিয়ে পরের পঙ্‌ক্তির সূচনা' প্রভৃতি গুণগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও দৃশ্যমান। ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, আরবি, চলতি ও 'শ্ল্যাঙ' সব মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাস্যরসের করণ-প্রস্তুত করেছিলেন, এমনকি *হাসির গান* রচনার সময়েও (১৯১১) তাঁর মধ্যে *Ingoldsby Legends*-এর স্মৃতি সজাগ ছিল। এই কাব্যে তাই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত কবিতাগুলির নির্মাণ-পদ্ধতি *Ingoldsby Legends*-এর মতোই। পুরাবেত্তা বারহাম তিন-চার শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটি একত্র করে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর মতো হাস্যরঙ্গের অবতারণা করেছেন 'তানসেন-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ', 'রাম-বনবাস', 'দুর্বাসা', 'কালোরূপ', 'কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ' এগুলির কালগত আবেদন স্বীকার করেই। এমনকি কর্তৃত্বসর্বস্ব দেশপ্রেমিক, অহংকারী ভাবুক, অপদার্থ হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাতা, দুর্বোধ্য রচনাকার, রক্ষণশীল ও নারীমুক্তিবাদী সকলেই বিদ্ধ হয়েছেন তাঁর ব্যঙ্গের বাণে। যে-সব নাট্যকার, কবি, সমাজব্যাখ্যাতা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের নিয়ে দেশে তখন হৈচৈ, তাঁর ব্যঙ্গাত্মক গানে উঠে এসেছেন তাঁরাও। উদাহরণ:

১. নাস্তিক এক দলের মধ্যে মিশলাম গিয়ে রঙ্গে,
Hume ও Mill ও Herbert Spencer পড়তে লাগলাম সঙ্গে।[৩৮]

২. না পড়েছে Shakespeare না পড়েছে Ganot,
Adam Smith-এর Political Economy জানে না,
Malthus-এর Theory of Population মানে না,
Huxley, Tyndall, Spencer, Mill-এর ধারও ধারে নাক।[৩৯]

৩. রৈল শুধু গেটে শিলার, ডারুইন, মিল,
আর ছেলের খরচ মেয়ের বিয়া।
'যায় যায় যায়'।[৪০]

এইসব গানের স্বকীয় নির্মাণকলায় দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কাব্যের 'নব-পথিকৃৎ' হিসেবে গণ্য। স্বদেশী সাহিত্যে ইউরোপীয় কবিতার মোহনীয় ভাবসম্পদকে আত্মীকৃত করে উনিশ শতকের উপনিবেশায়নের সবকটি প্রধান লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হলেও, মননকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'শুদ্ধ-বিদেশি প্যারাডির' আদর্শে 'হাসির গান' রচনা করে তিনি বাংলা কবিতার দিগন্ত-বিস্তার করেছেন।

৬.

উনিশ শতকের অপরার্ধে পাশ্চাত্য মননজাত আত্মকেন্দ্রিক স্বাধীনতার চেতনা থেকে উপর্যুক্ত কবিগণ রোমান্টিক এষণাকে কবিতার অনিবার্য করণে পরিণত করেছিলেন। আধুনিক কবিতার অন্যতম চারিত্র্যও সেটি, শিল্পের বিষয় ও বিন্যাসে শিল্পী যেখানে স্বাধীন এবং স্বনির্বাচিত যেকোনো বিষয়কে তিনি কবিতার অঙ্গীভূত করতে পারেন। পাশ্চাত্য-সাহিত্যে কবির এমন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রেনেসাঁসের ফলে: মানুষের ভাবপ্রকাশের সীমাহীন অধিকার থেকে উত্থান ঘটেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের; সেই সূত্রেই সমবায়ী সাহিত্যধারা থেকে সেখানে কবিতার পৃথক হয়ে যাওয়া।

ভাবাদর্শ হিসেবে প্রবল পরাক্রমশালী ও আকর্ষক এই চেতনার অন্যতম নির্মাতা দার্শনিক জাঁ-জাক রুশো (১৭১২-১৭৭২) ও টম পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) প্রাকৃত-জীবনবাদী গ্রন্থসমূহ [*Social Contract*; *Age of Reason* ও *Rights of Man*] মানুষের মুক্তির সাধনাকে ত্বরান্বিত করায় সাংস্কৃতিক চেতনাও প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়। যাকে আশ্রয় করে আঠারো শতকের শেষভাগে এসে তীব্রতর হয়েছে ধ্রুপদী ভাষা ও শিল্পরীতির নিগড় থেকে সাহিত্যের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাকৃত ভাষা ও ভাবধর্মকে অঙ্গীকার করে মানুষের রোমান্টিক চেতনা রচনা করেছে মুক্তির পথ। পাশ্চাত্যে রোমান্টিকতাবাদের এমন রূপ পরিগ্রহ করাটা ছিল ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরম্পরাগত ফল। যার পূর্বে (১৭০০-১৭৯৮) বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে মানুষের আবেগধর্ম বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল; আর শিল্প হয়ে উঠেছিল জ্ঞান-বুদ্ধি ও নিয়ম-নীতির সামূহিক নিয়ন্ত্রণ ও কৃত্রিম সৌকর্যে ভারাক্রান্ত। সেই সময়ের সাহিত্যে আবেগ-বিরোধিতার মাত্রা কেমন ছিল তা বোঝা যায় আলফ্রেড হাউসম্যানের (১৮৫৯-১৯৩৬) একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেছেন: "স্বভাবের গভীর থেকে বাঁচা মানুষ ভুলতে বসেছিল, মানুষের সময় কাটত তেমন সব চিন্তাচয়নে, যাদের পরিধি কখনো বোধির মণ্ডল ছাড়িয়ে যায়নি; মোমবাতি জ্বালিয়ে সে খড়খড়ি তুলে দিয়েছে কবিতার পৃষ্ঠপোষক চাঁদের বিরুদ্ধে।"[৪১]

ইংরেজরা এ-দেশ দখল করার আগে এ-রকম কোনো পরিস্থিতি বাংলায় অন্তত ছিল না; সারা বাংলায় তখন পালা, নাটক আর কবিগানের আসর বসতো; চাঁদের আলোয় উঠোনে জামায়েত হয়ে গাওয়া হতো বাঙালির প্রাণধর্মের কীর্তনগীত, পরিবেশিত হতো পদাবলী। ইংরেজরা আসার পরে সেই চর্চায় ছেদ সৃষ্টি

হয় এবং বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতাবাদী আন্দোলনের পূর্বের অবস্থার মতো বিরস হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু বাঙালির স্বার্থগত প্রচেষ্টায় এবং ঔপনিবেশিতক শক্তির প্রভূত প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে তখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতার অনুকরণ; আর বাংলার রোমান্টিক কবিরা নিজেদের দেশাচার ও সমাজগত ভাবের সত্য, কল্যাণ ও বিবেকের দায় জলাঞ্জলি দিয়ে ক্রমশ হয়ে ওঠেন পাশ্চাত্যের স্বার্থবাদী ও আত্মগত বোধের একদর্শী অনুকারক।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত বাংলার কবিগণের মনে এমন উপনিবেশায়নের ক্ষেত্রটি ছিল খুবই শক্তিশালী, তার ধরনটিও ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট; পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের মাধ্যমে শতবর্ষ ধরে এই মানুষদের নির্মাণ করা হয়েছে। ভিভিয়ান ডিরোজিওর 'ইঙ্গ-বাংলা' কবিতা থেকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মিনী উপাখ্যান* পর্যন্ত ঔপনিবেশিক কাব্যকলার বিকাশ তারই অনিবার্য ফল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর *সারদামঙ্গল কাব্য* পর্যায়ে এসে সেই পরিপ্রেক্ষিতটি বদলে যায়। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৮৫৫-১৮৫৬), 'সিপাহি বিপ্লব' (১৮৫৭) এবং 'নীল বিদ্রোহের' (১৮৫৯) মাধ্যমে জনসমাজে উন্মেষ ঘটে স্বাজাত্য-চেতনার। তবুও সিপাহি বিপ্লবের সীমান্তকাল ছুঁয়ে প্রণীত মধুসূদনের কাব্যপ্রকল্পনা স্বজাতির প্রতি উদাসীন এবং বিহারীলাল সর্বান্তকরণে নিমজ্জিত পাশ্চাত্যবাহিত রোমান্টিক চেতনায়।

তাঁদের শিল্প-এষণার নির্যাস অর্থাৎ 'নির্বিশেষ ঔদাস্য' ও 'রোমান্টিকতার' জাতক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; দিকপ্লাবী কাব্যপ্রকল্পনায় যিনি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর কালের 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিসম্রাট'। তাঁর প্রভাব-বলয়ের পরিধিভুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রধান চার কবি অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কাব্যাঙ্গিকে অনুসরণ করেছেন পাশ্চাত্যরীতি। কবিতার তত্ত্ব ও প্রকরণ সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন; কবিতায় কালান্তরের প্রেরণাও সঞ্চয় করেছিলেন তাঁরা; কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত উপলব্ধির সত্য সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ছিল বলে, কবিতায় তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটেনি। কালের প্রবণতা বাদ দিয়ে তাই তাঁদের কবিজীবনের সূচনা রোমান্টিক বহিরস্থিতরূপে এবং পূর্ববর্তী স্বদেশী কবিতার উত্তরাধিকার অস্বীকারের মাধ্যমে। তারপর ক্রমাগত তাঁরা প্রবেশ করেছেন আত্মগত মনোভূমির স্বার্থকেন্দ্রিকতার অন্ধকারে এবং ক্রমশ রোমান্টিক হতে হতে কবিতায় পরিব্যক্ত করেছেন এমন 'বায়বীয় ভাব', উপলব্ধির নিঃসীমতা থেকে তা জাত, ফলে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 'অপ্রতিপাদ্য'। জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) ও আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪), উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও এসটি কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪); আলফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২) ও রবার্ট ব্রাউনিঙয়ের (১৮১২-১৮৮৯) প্রাধান্যখচিত তিনটি যুগের ['নিউ-ক্লাসিক্যাল যুগ' (১৬০০-১৭৯৮), 'রোমান্টিক যুগ' (১৭৯৮-১৮৩২) এবং 'ভিক্টোরীয় যুগ' (১৮৩২-১৯০০)] সম্মিলিত অবদানকে মাত্র দুই দশকে (১৮৬০-১৮৮০) তাঁরা নিজেদের কবিতায় আত্মীকৃত করার চেষ্টা করেছেন। সেই প্রয়াস-পথেই বিস্মৃত হয়েছেন হাজার বছরের বাংলা কাব্যের অন্তর্লীন স্বভাবে অন্তঃস্থিত দুটি টান: 'গীতিময়তা' ও 'রোমান্টিকতা'। বাংলার এই 'রোমান্টিকতা' পাশ্চাত্যের 'রোমান্টিকতাবাদ' থেকে স্বতন্ত্র; *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য* বা *বৈষ্ণব পদাবলি* তার প্রমাণ। বাংলা কবিতার সেই রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বতোভাবে ভারতীয় এবং বিশেষত বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ভারতীয় জীবনসাধনার ভাববাদী কাঠামোর সঙ্গেই তার যোগ, ফলে এখানকার প্রকৃতি ও আরণ্যক-সভ্যতাদীপ্ত জীবনলীলার মধ্যেই তা নিহিত ছিল। পশ্চিমাগত রোমান্টিক কাব্যাদর্শের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন এই কবিগণের স্বদেশি সেই রোমান্টিক মনকে 'বিকৃত' করেছে। তাঁদের সৃজন-অভিজ্ঞানে পাশ্চাত্যবাহিত রোমান্টিকতার জারণও

অসম্পূর্ণ হওয়ায়, তাঁদের সমস্ত কাব্যপ্রয়াসই পর্যবসিত হয়েছে পশ্চিমা কাব্যের অন্ধ অনুকরণে। তাঁদের উত্তরকালে বাংলা কবিতার ভাব-প্রকল্পনায় তার প্রভাব বেশ দূরপনেয়, সে-কারণে কিছুটা হলেও বিপন্ন হয়েছে আবহমান বাংলা কবিতার স্বতোৎসরিত বিকাশ এবং ত্বরান্বিত হয়েছে বাংলা কবিতার উপনিবেশিত ভবিতব্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ময়ুখ চৌধুরী, *উনিশ শতকের নবচেতনা ও বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৬), ৪৪
২ Brian Hepworth, *Edward Young* (Manchester: Carcanet Press, 2007), 17
৩ শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, *যোগীন্দ্রনাথ সরকার* শতবার্ষিকী স্মরণ (কলকাতা: সিটি বুক সোসাইটি, ১৯৫৪), ১৫৮
৪ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, *মহিলা* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫০), ২০১
৫ সুরেন্দ্রনাথ, ২৩
৬ সুরেন্দ্রনাথ, ২২৮
৭ সুরেন্দ্রনাথ, ১৪
৮ Thomas Campbell, *The Complete Works* (GP Putnam and Sons, 1871), 211
৯ সুরেন্দ্রনাথ, ১২৫
১০ শক্তিব্রত ঘোষ, *কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কয়েকজন* (কলকাতা: বর্ণালী, ১৯৮২), ১৫
১১ John Crowne, *The Dramatic Works* (London: Legare Street Press, 2023), 318
১২ দেবেন্দ্রনাথ সেন, *নির্ঝরিণী* (কলকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, ১৮৮০), ১২
১৩ দেবেন্দ্রনাথ, ১২৫
১৪ John Keats, *Selected Poems* (London: Penguin Books, 2007), 270
১৫ মোহিতলাল মজুমদার, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: আধুনিক প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৬৩), ১৬৮
১৬ অক্ষয়কুমার বড়াল, *গ্রন্থাবলী*, সজনীকান্ত দাস সম্পা. (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৮), ২৮
১৭ PB Shelley, *Selected Poems* (London: Everyman Paperback Classics, 1990), 247
১৮ অক্ষয়কুমার, ৫১
১৯ অক্ষয়কুমার, ৬৩
২০ Robert Browning, *selected poems* (London: Penguin Classics, 2001), 138
২১ অক্ষয়কুমার, ৪১
২২ অক্ষয়কুমার, ২৪৫
২৩ অক্ষয়কুমার, ৩৩৬
২৪ অক্ষয়কুমার, ২৬
২৫ Johann Wolfgang von Goethe, *Faust* (UK: Oxford University Press, 1998), 586
২৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *গ্রন্থাবলী* (কবিতা ও গান)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পা. (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৪৬), ২১
২৭ দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৪
২৮ দ্বিজেন্দ্রলাল, ৫৬
২৯ দ্বিজেন্দ্রলাল, ৩২৮
৩০ দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৭
৩১ John Keats, 254
৩২ দ্বিজেন্দ্রলাল, ৩৮০
৩৩ দ্বিজেন্দ্রলাল, ৬২

[৩৪] দ্বিজেন্দ্রলাল, ৬২
[৩৫] দ্বিজেন্দ্রলাল, ১০২
[৩৬] দ্বিজেন্দ্রলাল, ৩৮৯
[৩৭] দ্বিজেন্দ্রলাল, ২২১
[৩৮] দ্বিজেন্দ্রলাল, ২৮৫
[৩৯] দ্বিজেন্দ্রলাল, ৩২৭-৩২৮
[৪০] দ্বিজেন্দ্রলাল, ২৭৯
[৪১] আলফ্রেড হাউসম্যান, *কাব্যের স্বভাব*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনু. (ঢাকা: পুণ্ড্র প্রকাশন, ২০২৪), ৩১